❑ ১.৫.৪ গীতাঞ্জলির যুগ

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন শেষ হয়ে যাবার পর রাজনৈতিক জগৎ থেকে কবি বিদায় গ্রহণ করেন এবং শান্তিনিকেতনের আশ্রম জীবনেই নিজেকে সম্পূর্ণভাবে উজাড় করে দেন। এই সময়ে কবির ব্যক্তিগত জীবনে কিছু দুঃখের অভিজ্ঞতাও ঘটেছিল। ১৯০২ সালে কবিপত্নী মৃনালিনীদেবী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ১৯০৭ সালে তার ১১ বছরের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথ মারা যায়। সম্ভবত পুত্র শোকের এই নিদারুণ বেদনার কয়েকদিন পরেই কবি রচনা করেন, প্রচণ্ড গর্জনে আসিল একি দুর্দিন। এরই মধ্যে 'খেয়া' কাব্যের কবিতাগুলি লেখা চলছিল। 'খেয়া'র অনেকগুলি গানে কবির তৎকালীন অন্তর্বেদনা ব্যাকুলতা এবং ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণের ইচ্ছাও প্রকাশিত হয়েছে যেমন — আমি কেমন করিয়া জানাব, একমনে তোর একতারাতে, তুমি যত ভার দিয়েছ, আমার নাইবা হল পারে যাওয়া, তুমি এপার ওপার কর ইত্যাদি। এই সময়ে ক্রমশই কবির চিত্তে একদিন গভীর ভক্তির ভাব উৎসারিত হচ্ছিল। তিনি বুঝতে পারছিলেন তাঁর জীবনে ধীরে ধীরে এক সুগভীর পরিবর্তন আসন্ন। মৃত্যু দুঃখ আঘাত বেদনার মধ্য দিয়ে, কবি যেন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানান যে এই শোক, এই ব্যক্তিগত সর্বনাশ যেন তাকে বিধ্বস্ত না করে। তিনি দেখলেন নিজের শোক যত তীব্রই হোক না কেন পৃথিবীর সৌন্দর্য কিন্তু এতটুকু কমেনি সুতরাং সেই বিশ্বসৌন্দর্যের মধ্যে বিশ্বেশ্বরের চরণে আত্মসমর্পণ করে নিজের জীবনকে পূর্ণ করে তুলতে হবে। জগতের আনন্দযজ্ঞের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে হবে। খেয়া কাব্য থেকে কবিমানস ক্রমশই অধ্যাত্ম চিন্তার গভীরে নিমগ্ন হতে লাগল এবং তারই, ফলশ্রুতি স্বরূপ খেয়া থেকে 'গীতাঞ্জলি'তে তার উত্তরণ। শান্তিনিকেতনের ধ্যানমগ্ন পরিবেশে কবিচিত্তে অধ্যাত্ম অনুভূতির দ্বারগুলি একে একে আশ্চর্যভাবে উদ্ঘাটিত হল, প্রকাশিত হল জীবন রহস্যের একটি নতুন দিক।

আধুনিক রবীন্দ্রকাব্য সমালোচকদের মতানুসারে— "রবীন্দ্রসংগীতের 'গীতাঞ্জলি'র গান রচনার যুগকে একটি বিশেষ 'সন্ধিযুগ' বলা হয়ে থাকে। 'গীতাঞ্জলি' কাব্যে কবিতার মোট সংখ্যা ১৫৭। তার মধ্যে ৮৫ টিতে রবীন্দ্রনাথের সুর দেওয়া এবং 'গান' নামে পরিচিত। 'গীতাঞ্জলি'র রচনাকাল ১৩১৩-১৩১৭ এই সম্বন্ধে গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে কবি লিখেছেন "এই গ্রন্থের প্রথম কয়েকটি গান পূর্বে অন্য দুই-একটি পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু অল্প সময়ের ব্যবধানে যে-সমস্ত গান পরে পরে রচিত হইয়াছে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে একটি ভাবের ঐক্য থাকা সম্ভবপর মনে করিয়া তাহাদের সকলগুলিই এই পুস্তকে বাহির করা হইল।" (৩১ শ্রাবণ, ১৩১৭) সুতরাং যথার্থ 'গীতাঞ্জলি' পর্ব হল ১৩১৬ সালের ১০ই ভাদ্র থেকে, ১৩১৭ সালের ২৯ শে শ্রাবণ পর্যন্ত। এই সাড়ে ১০ মাসের মধ্যে ১৩৭টি কবিতা ও গান রচিত হয়। কিন্তু যথার্থ রচনার দিন হচ্ছে ৯০ দিন। 'গীতাঞ্জলি'র সবগুলি কিন্তু গান নয়। এর মধ্যে ৫৬ টিতে সুর দেওয়া হয়েছে। অবশিষ্ট ৮১টি হল কবিতা অথবা সুর না দেওয়া গান। এই কালকেও আবার দুটি পর্বে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমটি হল ১০ই ভাদ্র থেকে ফাল্গুন ১৩১৬ মাস পর্যন্ত পর্ব— এই ৭ মাসের মধ্যে মাত্র ৩৪টি গান রচিত হয় ('গীতাঞ্জলি' ২১-৫৪)। এই গানগুলো রচনার দিনের সংখ্যা ২৩/২৪। দ্বিতীয় পর্ব হচ্ছে ২৬শে চৈত্র ১৩১৬ থেকে ২৯শে শ্রাবণ ১৩১৭ পর্যন্ত এই চার মাসের মধ্যে ৬৬টি নিয়ে ১৩৩টি কবিতা লেখা হয়।

'গীতাঞ্জলি' (১৯১০), 'গীতিমাল্য' (১৯১৪) 'গীতালি', (১৯১৪)-র প্রায় সব কবিতাই গান 'গীতধারা', যথার্থ আধ্যাত্মিক সংগীত, যার মধ্যে রয়েছে বিরহ বেদনা, আলোর জন্য আর্তি ও মুক্তির আনন্দ। এদেশে 'গীতাঞ্জলি'র যথার্থ সমাদর শুরু হয় ১৯১২-১৩ সাল থেকে অর্থাৎ ইংরেজী 'গীতাঞ্জলি' বিলেতে সমাদৃত হবার পর। 'গীতাঞ্জলি' পর্বের গোড়ার গানগুলি বর্ষাসংগীত কিন্তু এই বর্ষাসংগীতের সুরে কেবল বর্ষণের ঝঙ্কারই নেই বর্ষণের অন্তরালে যিনি আছেন তারই নুপুর নিক্কন শোনা যায় এবং সৌন্দর্যের অন্তরালে সুন্দরকে যেন দেখা যায় এযাবৎকালে কবি ধর্মসম্প্রদায়ের প্রয়োজনে ও প্রেরণায় ঈশ্বর বিষয়ক অসংখ্য গান রচনা করেছেন। প্রকৃতির, অর্চনা নানা সুরে ও ছন্দে গেঁথেছেন— এই উভয় শ্রেণীর গীতধারা থেকে কবির এই নবগীতধারার সুর স্পষ্টতই পৃথক, এই গীতধারায় দেবতা ও প্রকৃতি এবং তার সংগে মানব অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা পড়েছে। আগেই বলা হয়েছে যে কবির যথার্থ আধ্যাত্মিক সংগীতের সূত্রপাত এই গীতাঞ্জলি পর্ব থেকে কিন্তু এগুলিকে ব্রহ্মসংগীত বল্‌লে ভুল হবে। রবীন্দ্রনাথের এই নতুন গীতধারা আলোচনাকালে আমরা যেন ভুলে না যাই যে তিনি মুখ্যত স্বভাব-কবি। প্রকৃতির সৌন্দর্য সম্ভোগ তাঁর আবাল্যের সংস্কার। 'গীতাঞ্জলি' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন— এ আমার জীবনের ভিতরের জিনিস— এ আমার সত্যকার আত্মনিবেদনের মধ্যে আমার জীবনের সমস্ত সুখ দুঃখ, সমস্ত সাধনা বিগলিত হয়ে আপনি আকার ধারণ করেছে। এ বিষয়ে নীহাররঞ্জন রায়ের অভিমত— 'গীতাঞ্জলি'— 'গীতিমাল্য'— 'গীতালি'র গানগুলি কবির স্বীয় অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতার কথা, মর্মছেঁড়া বাণী, জাগ্রত অধ্যাত্ম— চৈতন্যের গোপন গুঞ্জন।"

আবু সয়ীদ আইয়ুব 'গীতাঞ্জলি'— 'গীতিমাল্য'— 'গীতালি'কে স্পষ্টতই ঈশ্বর প্রেমের কবিতা বা গান বলেছেন। এ আমির আবরণ' বইটিতে অধ্যাপক শঙ্খ ঘোষ লেখেন "শমীর মৃত্যুর কয়েকদিনের মধ্যেই কার শক্তিতে কবি লিখতে পেরেছিলেন 'তোমার অমল অমৃত পড়িছে ঝরিয়া? তিনি ধর্মীয় কোনো ঈশ্বর না-ও হতে পারেন কারও কাছে কিন্তু তিনি ব্যক্তিগতভাবে যেন সকলেরই

নিভৃত প্রাণের কোনো দেবতা, আত্মশক্তি যেন সকলের। প্রাণের লক্ষ্যে কোনো দেবতা নন, প্রাণই এখানে দেবতা, সেটা মনে রাখা চাই.....। (এ আমির আবরণ, পৃ. ৪০) তিনি জীবনকে শেষ পর্যন্ত Art রূপে দেখেছিলেন। প্রকৃতিই ক্রমশ গান ও কাব্যে, উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। অনেকের ধারণা এই যে কবির আধ্যাত্মিক অনুভূতি পূর্বের ন্যায় তীব্র ও আন্তরিক ছিল না, কিন্তু তা ঠিক নয়। শান্তিনিকেতন উপদেশমালায় কবি যার ব্যাখ্যা করেছিলেন বাক্যে, 'গীতাঞ্জলি'তে তাকে পেলেন সুরে। জীবনের প্রারম্ভে কবি রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সৌন্দর্যের পূজারী, জীবনের অন্তিমে, সাধক রবীন্দ্রনাথ সুন্দরের উপাসক। এই দুই অনুভূতি বিভিন্ন গুনধর্মী— একটি অজ্ঞানের পাওয়া অপরটি রসের উপলব্ধি। সেইজন্য আমরা কবির শেষদিক্‌কার গান বা কবিতাকে কেবলমাত্র সৌন্দর্য-সম্ভোগী Artist-এর সৃষ্টি বলে বিচার করতে পারি না, ওরা কবির পরিপূর্ণ দৃষ্টিলব্ধ, অশেষ সৌন্দর্যমণ্ডিত তুলনাহীন সৃষ্টি।

" 'গীতাঞ্জলি'র গানগুলির সুর ও তাল সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। কারণ গীতাঞ্জলির গানগুলির সুর গঠনের দিকটা গভীরভাবে অনুশীলন করলে বোঝা যায় যে এইসব গানের সুর রাগভিত্তিক হলেও মৌলিকতার গুণে বাণী ও সুরের মিশ্রিত 'অর্ধনারীশ্বর' রূপে প্রকাশমান।

[গীতাঞ্জলির গান— শ্রী প্রফুল্ল কুমার দাস গীতবিতান পত্রিকা; পৃ ৪৪]

'গীতাঞ্জলি'র যে ৮৫টি গানের স্বরলিপি প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে ৩২টি গান রাগনির্ভর এবং বাকী ৫৩টি গানের মধ্যে ৩টিতে বাউলের সুর, ২টিতে কীর্তণের সুর এবং ৪৮টিতে এক বা একাধিক রাগের মিশ্রণ ঘটেছে। রাগ নির্ভর ৩২টি গানের সুরের মধ্যে আবার ভৈরবী রাগের প্রাধাণ্য সমাধিক। কারণ এর মধ্যে ৭টি গানে ভৈরবীর সুর, তারপর ৫টি গানে ইমণকল্যাণ রাগের প্রাধান্য এবং অন্যান্য রাগের মধ্যে ইমণ, খাম্বাজ, ভৈঁরো, কানাড়া, শ্রী, দেশ, সরফর্দা, জয়জয়ন্তী, পূরবী, বাহার বেহাগ, কামোদ, ছায়ানট, গৌড়মল্লার, মেঘমল্লার, নটমল্লার এবং মল্লার প্রাধাণ্য পেয়েছে। যে গানগুলিতে কবি রাগমিশ্রণ ঘটিয়েছেন, তার বিশেষত্ব এই যে, কোন গানের সুরকেই কষ্টকল্পিত বলে মনে হয় না। বরং মনে হয় অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক। এর অবশ্য কারণও আছে কবি বলেছেন "সুরের সংগে কথার মিলন কেউ রোধ করতে পারবে না। ওরা পরস্পরকে চায়। সেই চাওয়ার মধ্যে যে প্রবল শক্তি আছে সেই শক্তিতেই সৃষ্টির প্রবর্তণা।"

ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর মতে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ভৈরব রাগ সিদ্ধ। এই রাগকে তিনি বিভিন্নভাবে বিভিন্ন গানে ব্যবহার করেছেন যেমন করেছেন 'গীতাঞ্জলি'র গানে। ভৈরবী ছাড়া মিশ্র টোড়ী এবং টোড়ী-ভৈরবী নামে পরিচিত গানগুলিতে ভৈরবী সুরের প্রভাব বেশী দেখা গেছে। যেমন— "আবার এসেছে আষাঢ়, উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী রথে ইত্যাদি, আবার ভৈরবে আছে আলোয় আলোকময় করে হে' এই গানটি। এছাড়া আরো অনেক রাগের গান পাওয়া যায়, যেমন—

১)	নিভৃত প্রাণের দেবতা	পূরবী
২)	ওরে মাঝি ওরে আমার	শ্রী
৩)	বিপদে মোরে রক্ষা করো	ইমন
৪)	বিশ্ব যখন নিদ্রামগন	বেহাগ
৫)	রূপ সাগরে ডুব দিয়েছি	খাম্বাজ
৬)	যতবার আলো জ্বালাতে চাই	কামোদ

এইসব শুদ্ধ রাগের ব্যবহার ছাড়াও মিশ্র রাগের গান আছে। তালের আলোচনায় 'গীতাঞ্জলি'র গানগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে ভারী তালের (যথা — চৈতাল, সুরফাঁকতাল, ধামার) ব্যবহার ১টি গানে ছাড়া আর কোনো গানে করা হয়নি, যেমন — (হরি অহরহ তোমারি বিরহ চৌতাল), এই গানে ছন্দের পরিবর্তন ঘটিয়ে একতালেও গাওয়া হয়। এছাড়া 'গীতাঞ্জলি'র গানে দাদরা, তেওড়া, কাহারবা, ত্রিতাল একতাল ঝাঁপতাল ইত্যাদি প্রযুক্ত হয়েছে। সর্বোপরি বলা যায় যে গানের সুরে প্রদানের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ রাগের প্রচলিত নিয়মকে সর্বদা মেনে চলতেন একথা মনে করার কোনো কারণ নেই। গানের কাব্যাংশের ভাব প্রকাশের জন্য যেমন প্রয়োজন, তেমনই সুর যোজনা করতেন। ছন্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রেও তার ছিল একই ধরণের পরীক্ষানিরীক্ষা। অল্প প্রচলিত এবং অপ্রচলিত তালগুলিকে তিনি সংগ্রহ করে গানের প্রয়োজনে তাল সৃষ্টি করেছেন। যেমন ষষ্ঠী ৬ মাত্রা রূপকড়া— ৮ মাত্রা, নবতাল— ৯ মাত্রা নবপঞ্চতাল— ১৮ মাত্রা। এই তালগুলি রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব উদ্ভাবন। 'গীতাঞ্জলি'র গানগুলিতে রবীন্দ্রনাথ নিম্নলিখিত, চতুর্দশ তালের ব্যবহার করেছেন এবং তালের মাত্রাসংখ্যা ৫ থেকে ১৮ পর্যন্ত। নিম্নে তালগুলির একটি তালিকা এবং কতগুলি গানে সেই তালটি ব্যবহৃত হয়েছে তার সংখ্যা দেওয়া হল— একতাল ২২, দাদরা— ১৫, তেওড়া— ১৩, কাহারবা ৪, ত্রিতাল— ৭, ঝম্পক— ৭,

কাওয়ালি— ৪, রূপকড়া— ৩, যৎ— ২, ঝাঁপতাল— ১, ধূমালী— ১, নবপঞ্চতাল— ১ ইত্যাদি।

এই তালিকায় দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ধ্রুপদাঙ্গের তালগুলির বিশেষ ব্যবহার করেননি।

গানের বাণী এবং বাণীর উপযোগী সুর সংযোজনায় কবি অত্যন্ত সজাগ ছিলেন এবং সচেতন ছিলেন। সেই বিষয়ে তিনি নিজেই বলেছেন— "আমার গানের কবিতাগুলিতে বাক্যের আসুরিকতাকে আমি প্রশ্রয় দিই নি অর্থাৎ সেইসব ভাব, সেইসব কথা ব্যবহার করেছি সুরের সংগে যারা সমানভাবে আসন ভাগ করে তারা বসবার জন্যই প্রতীক্ষা করে।

'গীতাঞ্জলি'র গানগুলি বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই এর মধ্যে নিম্নলিখিত ভাবধারাগুলি মুখ্য— (১) ব্রহ্মকে সহজে না পাওয়ার জন্য হতাশা ও প্রবল বিরহ বেদনার অনুভূতি। 'খেয়া' কাব্যগ্রন্থ থেকেই কবি পরম ব্রহ্মকে একান্তে পাওয়ার জন্য আকুল আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। এই আকাঙক্ষাই 'গীতাঞ্জলি'তে প্রবল বিরহ ব্যথায় রূপান্তরিত হয়েছে। যেমন— তুমি যদি না দেখা দাও অথবা আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার, কিংবা হেথা যে গান গাইতে আসা ইত্যাদি। আবার গভীরতম দুঃখের প্রকাশ দেখা যায় 'যতবার আলো জ্বালাতে চাই' গানে।

(২) অহঙ্কার ত্যাগ করে দুঃখের দাহে হৃদয়কে নির্মল করে ভাগবৎ, উপলব্ধির উপযোগী-এর প্রকাশ ঘটেছে এই গানটিতে— 'তব দয়া দিয়ে হবে গো মোর জীবন ধুতে।

(৩) প্রকৃতি ও মানবের বিচিত্র রূপ রসে ব্রহ্মের আভাস ও প্রাণস্পর্শের অনুভূতি। যেমন— 'আমার নয়ন ভুলানো এলে' গানে। কখনও বা পরম প্রাপ্তির আশ্বাসে ধরণী অসীম আনন্দে উদ্বেল হয়ে ওঠে, গান-'জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ'।

(৪) দীণ দরিদ্রের মধ্যে, হীন অস্পৃশ্যদের মধ্যে পরম ব্রহ্মের অবস্থান ধরণীর ধূলায় তার আসল অনুভূতি— "বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো"।

(৫) সীমা এবং অসীমের লীলাতত্ত্বের অনুভূতি "কবে আমি বাহির হলেম"।